যৌনতা ও ক্ষমতার সমীকরণ

মুস্তফা হুসাইন

একশো বছর আগে, ১৯২২ সালে ইতালিতে ক্ষমতায় আসে ফ্যাসিবাদের জনক হিসেবে খ্যাত বেনিতো মুসোলিনি। মুসোলিনির এই উত্থানের মধ্যে বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত দিক ছিল। এই সময়টাতে ইতালির সমাজ ও রাজনীতিতে আধিপত্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টির। মুসোলিনি নিজেও প্রথমে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও জনপ্রিয় সাংবাদিক। প্রথম বিশযুদ্ধে ইটালির অংশগ্রহণের ব্যাপারে পার্টির অবস্থানের সাথে দ্বিমত করায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখনই মুসোলিনি গড়ে তোলে জাতীয় ফ্যাসিস্ট দল, এবং দক্ষতার সাথে অতি দ্রুত ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয়। মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার পর চরম নিপীড়ন ও অপদস্থতার স্বীকার হতে হয় বামদের।

অন্য আরও অনেকের মতো বন্দি হয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আন্তোনিও গ্রামসি। কারারুদ্ধ অবস্থায় গ্রামসি বামপন্থীদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে। দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যাপক প্রভাব সত্ত্বেও কেন কমিউনিস্টরা 'ভুঁইফোড়' মুসোলিনির হাতে পরাজিত হলো? এ প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে গিয়ে গ্রামসি উপসংহার টানে—

> "সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজিমনি ক্ষমতা ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক!"

গ্রামসির এই সামাজিক আধিপত্য তত্ত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আসিফ আদনান লিখেছেন,

> "সংস্কৃতি আসলে কী?
>
> কিছু নিয়ম, রীতিনীতি, প্রথাপ্রচলন, কিছু ট্যাবু, কিছু মূল্যবোধের সমষ্টিই তো, তাই না?
>
> গ্রামসির মতে, কেউ যদি সমাজের ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং কেউ যদি জনগণকে বোঝাতে পারে—যেসব সাংস্কৃতিক রীতিনীতি (norms) আমাদের সমাজে আছে, সেটাই পৃথিবীর চিরন্তন রীতি, সবকিছু এভাবেই সবসময় ছিল অথবা এভাবেই সবসময় থাকার কথা—তাহলে মানুষ বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে আপত্তি করবে না।"

এখানে একটি বিষয়ে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামসি "হেজিমনি" বা "আধিপত্য" শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিল। গ্রামসির চিন্তায় হেজিমনি হলো এমন কর্তৃত্ব, যা কর্তৃত্বাধীনরা স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। গ্রামসি তত্ত্বটি উপলব্ধি করেছিলেন কারাগারে এবং সেখানেই তিনি মারা যান। পরবর্তীকালে তার এই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায় জার্মানির ফ্র্যাংকফুর্ট এর কিছু বাম যারা নিও-মার্কসিস্ট বুদ্ধিজীবি। হিটলারের শাসনামলে এই বাম তাত্ত্বিকরা নাৎসি জার্মানী পালিয়ে এসে ঘাঁটি গাড়ে আমেরিকায়। এদের চিন্তাধারাই পরে পরিচিতি লাভ করে 'ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুল' নামে! যা পশ্চিমা মার্কসবাদ, কালচারাল মার্কসবাদ বা নিউ লেফট নামেও পরিচিত। এসকল চিন্তাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়রা হচ্ছেন থিওডর এডোর্নো, ম্যাক্স হর্খহেইমার, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, হার্বার্ট মার্কিউস, এরিক ফ্রম, জার্গেন হেবেরমাস প্রমুখ।

ফ্র্যাংকফুর্ট ধারার তাত্ত্বিকদের মতে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তারের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরনো সংস্কৃতি ভেঙে নতুন এক সংস্কৃতির উত্থান ঘটানো জরুরি। কেননা, রক্ষণশীল ও ধর্মীয় সমাজে নাস্তিক্যবাদী ও কট্টর সেক্যুলার মানসিকতা প্রবেশ করানো অসম্ভব। যার কারণে তাদের পক্ষে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার সম্ভবও ছিল না। ৩০-এর দশকে আমেরিকায় পালানো অল্পসংখ্যক এই দার্শনিকরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন মুলুকে নিজ তত্ত্বের সফল প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়। ব্যাপক জনপ্রিয় কিছু বই লিখে শুরু করার পর, পর্যায়ক্রমে প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় ও মিডিয়াতে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে তাত্ত্বিকতা থেকে

বাস্তবতায় নিয়ে আসে গ্রামসির অনুসারী ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুল।

সমাজ ও শাসনকাঠামোতে মিডিয়া ও সংস্কৃতির প্রভাব বোঝাতে গিয়ে, কালচারাল মার্কসিজমের অন্যতম কাণ্ডারি হার্বার্ট মার্কিউস তার ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত One Dimensional Man বইয়ে বলেন,

> "মানুষ এখন (১৯৬৪'র আমেরিকায়) যৌনবিপ্লব, পপুলার মিউজিকসহ গণমাধ্যম নিয়ে এতটাই পরিতুষ্ট যে, তারা কোনো ধরনের (রাষ্ট্রীয়) জুলুমের ব্যাপারেই রুখে দাঁড়াতে আর আগ্রহ অনুভব করে না।"

মূলত তাদের গুরু কার্ল মার্কস যা আলোচনা করে যায়নি, সেদিকটি নিয়েই আলোচনা তুলেছিল কালচারাল মার্কসবাদীরা। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো, বিশেষত মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ নষ্ট করার জন্য তারা রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান-সহ নানা ক্ষেত্রে ভিন্নমুখী দর্শন সামনে নিয়ে আসতে শুরু করে।

এদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পশ্চিমের আগেকার রক্ষণশীল, ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ ছিল শাসনক্ষমতায় বামপন্থীদের কার্যকর ভূমিকা রাখার পথে অন্যতম প্রধান বাধা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাই দর্শন ও চিন্তাধারার সংস্কার ছিল জরুরি। 'ক্রিটিকাল থিওরি' শিরোনামে এসকল কট্টর সেক্যুলার, কালচাড়াল বামরা অর্থনীতির গৎবাধা আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসে জোর দিতে শুরু করে ভূরাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, সাইকো-এনালাইসিস থেকে নিয়ে জ্ঞান ও দর্শনের বহুমুখী শাখায়।

'কালচাড়াল' বামরা শুধু তত্ত্ব হাজির করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং নিজেদের তত্ত্ব বাস্তব ময়দানে প্রয়োগেও সক্ষম হয়। তারা উপলব্ধি করেছিল, ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন যে কিছু গেলাতে হলে সরাসরি পদক্ষেপের বদলে, একাডেমিক পেপার, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের সাহায্য নেয়া বেশি উপযোগী। এতে করে তাদের নিজস্ব ঘরানার গণমাধ্যমের প্রচার ও বুদ্ধিজীবিদের বয়ানই চলতেই থাকে, যতক্ষণ না নবনির্মিত চিন্তাগুলো মানুষ গ্রহণ করে নেয়, এবং এগুলোকেই "status quo" বা 'স্বাভাবিক অবস্থা' মনে করতে শুরু করে।

আজ আমরা পশ্চিমা যে সমাজ ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা দেখছি; যা ক্রমশ আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করছে, তার পেছনে আছে ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুল এবং সাংস্কৃতিক মার্কসবাদের গভীর প্রভাব। যার ফলে আজ আমরা দেখছি—

পুরুষদের দাড়ি কেটে নারীর রূপধারণ কিংবা নারীদের চুল ছেটে পুরুষের রূপ ধারণ এখন স্বাভাবিক। বরং, এমনটাই এখন গ্রহণযোগ্য, প্রশংসনীয় বা আধুনিকতা। শুধু তাই না, খোদ লিঙ্গ পরিবর্তনের মতো বিষয় এখন পশ্চিমা বিশ্বে ডালভাতের মতো। পাশাপাশি আমরা দেশীয় বা পশ্চিমা সেক্যুলার সংস্কৃতির মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ছুঁড়ে ফেলার প্রবণতাও গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে ব্যাপক হতে দেখেছি।

ম্যাক্স হর্খহেইমার ও থিওডর এডোর্নো তাদের 'বিখ্যাত' বই Dialectic of Enlightenment লিখেন,

> "কালচার (ইন্ড্রাস্ট্রি) আজ সবাইকে সমানভাবে প্রভাবিত করছে; হোক তা ফিল্ম, রেডিও বা ম্যাগাজিনের মাধ্যমে... এসব মাধ্যমের একটি অপরটিকে শক্তিশালী করছে।"

ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুলের চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো যৌনতা। তাদের মতে সমাজকাঠামো পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রের শাসন ও পলিসিতে প্রভাব বিস্তার করতে হলে আগে সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। আর যে-কোনো জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে 'যৌনতা'। তাই কালচারাল বামদের ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুল এবং "ক্রিটিকাল থিওরি"র কেন্দ্রীয় মেহনতের ফসল হলো ষাটের দশকে আমেরিকার 'যৌন বিপ্লব'; যা হাজার বছরের পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

এর ফলাফল হিসেবে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের সরিয়ে আমেরিকার রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে শুরু করে কালচারাল মার্কসিজম দ্বারা প্রভাবিত রাজনীতিবিদরা। ক্রমান্বয়ে এ প্রভাব এতই ব্যাপক হয় যে, এনলাইটেনমেন্টের পর খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের

যতটুকু পশ্চিমে টিকে ছিল, এই অদম্য উদ্দামতার সামনে তাসের ঘরের মতো তাও ভেঙে পড়তে শুরু করে। কেননা, সামগ্রিকভাবে যৌনতার ব্যাপারে সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মোটা দাগে একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে থাকে। যৌনতার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রকে।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনতা যেমন শক্তিশালী জাতি ও সমাজকাঠামো নির্মাণে ভূমিকা রাখে, তেমনই বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত যৌনতা পতন ঘটায় জাতি ও সভ্যতার। জোসেফ আনউইন তার ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত Sex and Culture বইয়ে দেখান যে,

> একটি জাতির সাংস্কৃতিক অগ্রসরতা ও যৌন সংযম পরস্পর পরিপূরক। অসংযত যৌনতাই শক্তিশালী জাতির সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক-রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ... যৌন-উগ্রতা জাতির উদ্ভাবনী ও আধিপত্য বিস্তারের শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে।

যেমনটা কবি ইকবাল বলেছেন,

> "আসো তোমাকে বলি জাতির উত্থান-পতনের সূত্র,
>
> শুরুতে তির-তরবারি আর শেষে শরাব-সেতার-নৃত্য!"

জোসেফ আনউইনের মতে, কোনো জাতি সমৃদ্ধ হবার পর ক্রমেই যৌনতার ব্যাপারে 'উদার' হতে শুরু করে। অবাধ যৌনতা এবং এর ফলাফলের কারণে সেই জাতি তখন তার সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। হারাতে শুরু করে, উদ্দীপনা ও লক্ষ্য। অবক্ষয় ও অধঃপতনের এই গতি অপরিবর্তনীয়।

একারণেই বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আগাগোড়া সেক্যুলার সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উগ্র-সেক্যুলার কালচাড়াল বামরা "ক্রিটিকাল থিওরি"র মোড়কে পশ্চিমের যৌন-নৈতিকতা বদলাতে জোরেশোরে মেহনত শুরু করে!

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যৌনতা সম্পর্কে জার্মান মনোবিশ্লেষক উইলহেম রাইশের বিভিন্ন তত্ত্ব। রাইশই সর্বপ্রথম তার বইয়ে 'যৌনবিপ্লব' বা 'Sexual Revolution' কথাটি ব্যাবহার করে। বইটির নাম ছিল Die Sexualität im Kulturkampf, যার অর্থ দাঁড়ায়— 'সাংস্কৃতিক যুদ্ধে যৌনতার ভূমিকা'। বইটির উপ-শিরোনাম ছিল, 'zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen', অর্থাৎ 'সমাজতন্ত্রের উপযোগী মানুষের পুনঃনির্মাণ'। পরবর্তীকালে বইটি ইংরেজিত প্রকাশিত হয় Sexual Revolution নামে ।

এ বইতে বিকৃতমনা রাইশের মূল বক্তব্য ছিল,

> "স্বৈরাচারী শাসকরা যৌনতাকে ব্যাপক ও স্বেচ্ছাচারী হতে দেয় না জুলুমের হাতিয়ার হিসেবে। দুর্বলকে শাসনের উদ্দেশ্যেই শাসকগোষ্ঠী 'যৌনতার স্বাধীনতা'য় (যেমন: সমকামিতা, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা ইত্যাদি) হস্তক্ষেপ করে। আর যৌনক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই, নিপীড়িত শ্রেণী পরিবর্তন বা বিপ্লবের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। তাই, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে অবাধ যৌনতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।"

সুন্দর পাত্রে বিষ পরিবেশনের কী বিচিত্র নমুনা!

'ক্রিটিকাল থিওরি'র আরেক গডফাদার, যৌনবিপ্লবী হার্বার্ট মার্কিউস তার বিখ্যাত এবং কুখ্যাত বই Eros and Civilization এ লিখেন,

> "যৌনতার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা বা দমন করার মানসিকতা, মানবজাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। আর

> যৌনতার ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ান (অর্থাৎ রক্ষণশীল) মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই একটি উন্নত বিশ্ব নির্মাণ সম্ভব!” (পৃ. ২২৭-২২৮)

অর্থাৎ, কেউ যখন নিজ চাহিদাকে আল্লাহর ভয়ে বা সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের কারণে দমন করে, তখন তা সমাজ ও মানবজাতির জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। অবাধ যৌনতাই হলো উন্নতির পথ! পরে ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুলের কালচারাল মার্কসবাদীদের হাত থেকে যৌনবিপ্লব ও সমাজের নৈতিকতা বদলে ফেলার দায়িত্ব বুঝে নেয় বর্তমানের পোস্ট-মডার্নিস্ট হিসেবে পরিচিত নব্য বামপন্থী সেক্যুলাররা।

মার্কসবাদ হলো লিবারেলিজম নামক ধর্মের একটি মাযহাব। আর সেই মাযহাবের ভেতরে একটি উপ-মাযহাব হচ্ছে ‘ফ্র্যাংকফুর্ট স্কুলের কালচাড়াল মার্কসিজম’। যার বিবর্তিত রূপ হলো হাল জমানার ‘পোস্ট-মডার্নিজম’। এই মাযহাবের অনুসারী বামপন্থী সেক্যুলাররা স্বাভাবিক যৌনতাকে—পুঁজিবাদী, ক্ষমতাসীন শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার মনে করে। তাই ক্ষমতার সমীকরণ বদলে দিতে, সমাজে অবাধ ও বিকৃত যৌনতার প্রচার-প্রসারকে তারা অপরিহার্য সাব্যস্ত করে।

উগ্র-সেক্যুলার সমাজ কায়েমে যৌনবিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করতে উইলহেম রাইশ আর হার্বার্ট মার্কিউসের পর অগ্রগামী ভূমিকা রাখে মিশেল ফুকো আর জুডিথ বাটলারের মতো দার্শনিকরা। এদেশীয় সেক্যুলার কালচাড়াল বামরা; যারা স্বঘোষিত পোস্ট-লিবারেলিস্ট, কথায় কথায় এদের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

সহজভাবে বললে—সমকামিতা, উভকামিতা, পশুকামিতা বা অজাচার-সহ সব ধরনের বিকৃত যৌনাচার কালচাড়াল মার্কসবাদীদের কাছে বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কারণ এসবের মাধ্যমে সমাজের যৌন-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তন। আর যৌনতার সাহায্যে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে শুরু করে সমাজ ও সংস্কৃতি। তাই পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই বিচিত্র ও বিকৃত সব চিন্তাধারার সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণে তারা নিরন্তর মগ্ন!

এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বোঝা জরুরি। এখানে বিপ্লব দ্বারা যৌনবিপ্লব উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো শাসনকাঠামোর খোলনলচে পাল্টে দেয়া। যৌনবিপ্লবের কাজ হলো মূল বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরি করা। সেক্যুলার, কালচাড়াল বামদের কাছে যৌনবিপ্লব উপকরণ, উদ্দেশ্য নয়।

মুখরোচক গালভরা তত্ত্বকথার ডালি সাজিয়ে, শাসক আর মিডিয়ার ছত্রছায়ায় কালচার মার্কসিস্ট ও পোস্ট-মডার্নিস্টরা পশ্চিম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিয়েছে ধর্মহীনতা, আইডেন্টিটি পলিটিক্স, যৌনবিপ্লব, আপেক্ষিক নৈতিকতা আর অপশাসনের মড়ক। তারাই আজ সমকামিতা, উভকামিতা বা ট্রান্সজেন্ডার মুভমেন্টের মতো বিকৃত মানসিকতাকে স্বাভাবিকীকরণে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, পোস্ট-মডার্নিজমের অন্যতম পুরোধা মিশেল ফুকো স্বয়ং ছিলেন বিকৃতমনা এক সমকামী। যৌন বিকৃতির এই প্রবণতা দেখা যায়, উইলহেম রাইশ, জুডিথ বাটলার থেকে শুরু করে এই আন্দোলনের আরও অনেকেদের মধ্যে।

মুসলিম-সমাজে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারে সেক্যুলারদের অন্যতম হাতিয়ার হলো যৌনতার অবাধ বিস্তৃতি। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে বিকৃত যৌনতার প্রসারে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষণ আসে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে। আদর্শিকভাবে মুসলিমরা অন্য যে-কোনো জাতির চেয়ে শক্তিশালী হবার কারণে মুসলিম-সমাজে অবক্ষয়ের প্রচারে তারা বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তাছাড়া মুসলিম-সমাজে সেক্যুলার শাসনের আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্যও অবাধ যৌনতা ছিল জরুরি। কেননা অবাধ যৌনতার বিষাক্ত চোরাবালিতে আটকে যাওয়া সমাজ কখনোই নিজ আদর্শ ও অধিকার আদায়ে সচেতন হতে পারবে না। একথাটা মুসলিমদের জন্য আরও বেশি সত্য। কারণ যৌনবিপ্লবের লাগামহীন দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি ইসলামের দেয়া বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতার শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। ব্যক্তিগত জীবনে যে অবাধ যৌনতার দৃষ্টিভঙ্গি আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, সে কিভাবে সমাজ ও শাসনে ইসলামি শরীয়াহর আধিপত্য চাইবে?

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, "সাংস্কৃতিক অঙ্গন", গণমাধ্যম এবং সচিবালয়েও এসব নোংরা চরিত্রের বামদের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। সেক্যুলার শাসকগোষ্ঠী, সুশীল বাম বুদ্ধিজীবি ও মিডিয়ার ত্রিমুখী শয়তানী চক্রের ধারাবাহিক ও সমন্বিত কার্যক্রম, ধীরে ধীরে আমাদের সমাজকে অবাধ যৌনতা ও যৌনবিপ্লবের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হুমায়ুন আজাদ, ফরহাদ মজহার বা সলিমুল্লাহ খানদের সুলুক সন্ধান করলে দেখা যাবে, এদের প্রত্যেকেই কালচাড়াল বামদের আদর্শিক জারজ।

জাতিকে যৌনতার ব্যাপারে সুস্থ, স্বাভাবিক তথা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ফিরিয়ে আনা তাই ইসলামি জাগরণ ও বিপ্লবের অন্যতম প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। আজ ইসলামপন্থীরা যদি মুসলিমদের জমিনে ইসলামের শাসন ফিরিয়ে আনতে চায়, ইসলামি বিপ্লবের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করতে চায়, আর গড়ে তুলতে চায় উপযুক্ত জনবল, তাহলে অবশ্যই মুসলিম নারী-পুরুষকে অবাধ যৌনতার করাল গ্রাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। তা না হলে আত্মমর্যাদা, হিম্মত ও আত্মত্যাগের মানসিকতা অনুপস্থিত থাকায় সাহাবিদের ন্যায় গড়ে উঠবে না আদর্শ প্রজন্ম; যারা আসন্ন ইসলামি বিপ্লবের ঝাণ্ডাধারী হবে! খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই সব মা আর স্ত্রীদের; যাদের শিক্ষা, বিনয়, হায়া ও কোমলতা জাতিকে উপহার দিতে পারে আদর্শ বিপ্লবী পুরুষ!

বিকৃত কিংবা অবাধ যৌনতায় মত্ত মুসলিমের পক্ষে ইসলামের কিছু ইবাদাত আদায় সম্ভব হলেও, নিজ জাতির কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মতো ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা অসম্ভব। চাই তার নামের শুরু আর শেষে থাকুক নানামুখী লকব, কিংবা মাথায় থাকুক দর্শনীয় পাগড়ি।

যৌন-উগ্রতায় মত্ত জাতি বিপ্লবের অনুপযোগী!

অশ্লীলতার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া যুবক আত্মত্যাগে অক্ষম!!

ইসলামপন্থীদের তথা মুসলিমদের আজ অপরিহার্য দায়িত্ব হলো,

- শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামো ব্যতীত ইসলামের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা বা ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। আর সুসংহত ইসলামি সমাজকাঠামো তৈরিতে বিকৃত ও অবাধ যৌনতার অপসারণ আবশ্যক। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করা।

- সাংস্কৃতিক যুদ্ধের ময়দানে সেক্যুলারদের পরাজিত করতে ভূমিকা রাখতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে অনৈতিক ও অস্বাভাবিক যৌনতা থেকে পরিচিত-অপরিচিতদের দূরে রাখার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা জারি রাখা।

- পুরুষদের দ্রুত স্বনির্ভর হওয়া এবং পঁচিশ পেরোনোর আগে বিয়ের চেষ্টা করা। অন্যথায় কম খাওয়া, কম ঘুম ও সিয়ামের অভ্যাস জারি রাখা।

- 'কালচাড়াল' বাম তথা হাল জমানার পোস্ট লিবারেলিস্টদের মানবতাবিরোধী কুদর্শন ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ক্রিটিক হাজির করা এবং তাদের আদর্শিক ও জ্ঞানগত দেউলিয়াপনা উন্মোচনে বিদ্যমান সুলেখক, অ্যাক্টিভিস্ট ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মনোযোগী হওয়া।

- বৈরী পরিবেশ সত্ত্বেও, সম্ভাব্য সকল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ক্রমাগত মানসম্মত দাওয়াহ, পরামর্শ চালিয়ে যাওয়া। বৃহত্তর পরিসরে সহজবোধ্য আলোচনা, ম্যাগাজিন, বই, পডক্যাস্ট, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি জাতির মাঝে সরবরাহে ভূমিকা রাখা।

সর্বোপরি, অবাধ যৌনতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা চাই।

আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করুন।